সমতলের প্রণম্য আদিবাসী নারী

পাভেল পার্থ

আদিবাসীদের জল-জলা-পাহাড়-জঙ্গল-প্রাণসম্পদ-অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের ঐতিহাসিক পরিসর বারবারই অনস্তিত্বশীল হয়েছে অধিপতিশীল ইতিহাস রচনা কাঠামোয়। সেখানে জাত্যাভিমানী ও পুরুষতান্ত্রিক একপেশে ইতিহাসনির্মাতাগণ আদিবাসী নারীর ইতিহাসকে করেছে আরো দলিতমথিত ও প্রান্তিক। হাজংদের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, টংক আন্দোলন, হাতিখেদা আন্দোলন, চাকমা বিদ্রোহ, খাসি বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ, মৈতৈ ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী দের ভানুবিল আন্দোলন, পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম, তেভাগা আন্দোলন, নানকার বিদ্রোহ, চা-শ্রমিক আন্দোলন, ইকোপার্কবিরোধী আন্দোলন, ফুলবাড়ি কয়লাখনিবিরোধী আন্দোলন কী বাগদাফার্ম ভূমি সুরক্ষা আন্দোলন, প্রভৃতিতে আদিবাসী নারীর স্বীকৃতি ও ভূমিকা অগ্রন্থিত ও অস্বীকৃত। রাষ্ট্রের ইতিহাসেই কেবল নয়, পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আদিবাসী সমাজেও নারীর প্রতিরোধী ইতিহাসকে খুব একটা মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। হাজার হাজার সাঁওতাল নারী-পুরুষ সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে সূচনা করেছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহ কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাসে সাঁওতাল নারীর ভূমিকাকে কখনোই স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। সাঁওতাল বিদ্রোহের লিখিত দলিল পাঠে মনে হয়, এ যেন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাঁওতাল পুরুষেরই লড়াই। কোনো গণআন্দোলনের এই ধরনের দলিলায়ন একটি পুরুষতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই স্পষ্ট করে।

কী মাতৃসূত্রীয় কী পিতৃসূত্রীয় আদিবাসী সমাজগুলোও চলতি সময়ে পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাস দলিলায়নের প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে আদিবাসী গণআন্দোলনসমূহকে কেবল পুরুষের ইতিহাস বানিয়ে ফেলছে। অগণিত সাঁওতাল নারী-পুরুষের সম্মিলিত ঐতিহাসিক হুল বা সাঁওতাল বিদ্রোহ তাই আজ অনেকের কাছেই হয়ে উঠেছে কেবল 'সিধু-কানু দিবস'। অথচ ফুলমণি মুর্মু এবং জান মুর্মুরা এই হুলের নেতৃত্বে ছিলেন। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল হুল রাষ্ট্রে নারীর প্রান্তিকীকরণের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ব্যবস্থার পুরুষতান্ত্রিকতাকে প্রশ্ন করেছিল ঐক্যবদ্ধ কায়দায়।

১৪ জুলাই ১৮৫৫ সালের *বেঙ্গল হরকরার* বহরমপুরস্থ সংবাদদাতা কর্তৃক লিখিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, 'অন্য একটি সূত্রে খবর পাওয়া গেল যে বিক্ষোভের জন্য দায়ী হলো রাজমহল রেলের কর্মচারীদের অত্যাচারে উদ্ভূত অসন্তোষ। বলা হয়েছে যে, এইসব কর্মচারীরা সাঁওতালদের ন্যায্যমজুরি দিত না। সাঁওতালদের বিক্রিত ডিম, মুরগি ও

অন্যান্য জিনিসের দামও তারা দিত না। উপরন্তু, তারা কিছু সাঁওতাল রমণীকে নিয়ে গিয়েছিল। এই শেষোক্ত দুষ্কর্মটি গোটা গোষ্ঠীকে প্রকাশ্য বিদ্রোহে প্ররোচিত করে তুলল। তারা তাদের দেবতার সম্মুখে শপথ করল যে তাদের প্রতিহিংসার আগুন থেকে একটি ফিরিঙ্গিকেও তারা নিস্কৃতি দেবে না।

ব্রিটিশ আমলের ঘটনা, বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার আমরাইল ছড়া চা বাগানের ফাঁড়ি বাগান হুগলীছড়ার নারী চা-শ্রমিকেরা বাগানের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নবিরোধী এক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। নারী চা-শ্রমিকদের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই আন্দোলনই বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম দিকের কোনো আন্দোলন, যেখানে নারী-পুরুষেরা ঐক্যবদ্ধ কায়দায় ক্ষমতা কাঠামোকে প্রশ্ন করে যৌন নিপীড়নের বিচার দাবি করেন। চলতি আলাপখানি সমতল অঞ্চলের কয়েকজন প্রণম্য আদিবাসী নারীর একেবারেই ক্ষুদ্র বয়ান।

কৃষকের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের অগ্রদূত কুমুদিনী হাজং

হাজং বিদ্রোহের বীর কুমুদিনী হাজং নেত্রকোনার দুর্গাপুর এলাকায় হাজং কৃষকদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের ভিতর দিয়ে আমাদের জানিয়েছেন, কীভাবে কৃষিস্বার্থবিরোধী অত্যাচারী জমিদার, রাজা ও জুলুমবাজ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জনগণআন্দোলন গড়ে তুলতে হয়। হাজং অতিথ চন্দ্র রায় ও জনুমণি হাজং-এর কন্যা কুমুদিনী ১১ বছর বয়সেই বিয়ে করেন নেত্রকোনা জেলার বহেরাতলী মাইঝপাড়া গ্রামের ১৫ বছরের কিশোর লংকেশ্বর হাজংকে। ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু হওয়া টংকপ্রথাবিরোধী আন্দোলনে কুমুদিনী ও লংকেশ্বর উভয়েই জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৬ সালের ৩১ জানুয়ারি সকাল দশটার দিকে বিরিশিরি থেকে সিমসাং নদী পাড়ি দিয়ে ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বহেরাতলী গ্রামে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর একটি সশস্ত্র দল লংকেশ্বর হাজংকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কুমুদিনীদের বাড়ি আক্রমণ করে। লংকেশ্বরকে না পেয়ে আক্রমণকারীরা কুমুদিনীকে ধরে নিয়ে যেতে চায়। কারণ এরা উভয়েই সরকারের অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করছিলেন। সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রামব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন হাজং মাতা রাশিমণি হাজং। তিনি সকলকে নিয়ে লড়াই করে কুমুদিনীকে ছাড়িয়ে নেন। ওই দিনই সশস্ত্র রাইফেলসের গুলিতে শহীন হন রাশিমণি হাজং, দিস্তামণি হাজং, বাসন্তি হাজংসহ প্রায় ১২ জন লড়াকু হাজং বীর। পরবর্তীকালে বহেরাতলী, হালুয়াঘাটের লক্ষীকুড়াসহ আশপাশের গ্রামে সরকারের দুঃশাসন এবং কৃষিবিরোধী বৈষম্যমূলক টংকপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন কুমুদিনী।

দুনিয়ার পয়লা আদিবাসী ভাষাশহীদ সুদেষ্ণা সিংহ (১৯৬৪-১৯৯৬)

দুনিয়ায় এ যাবৎ দু'জন নারী ভাষার লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছেন। তাদের দু'জনই ভারতের বরাক উপত্যকায়। কমলা ভট্টাচার্য আসামের বাংলাভাষা আন্দোলনে শহীদ হন এবং সুদেষ্ণা সিংহ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা আন্দোলনের জন্য শহীদ হন। আসামের বরাক উপত্যকায় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের দীর্ঘ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৬ মার্চ একটি রক্তক্ষয়ী দিন। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ভাষাবিপ্লবীরা বরাক উপত্যকায় ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে ৫০১ ঘণ্টার রেল অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৯৯৬ সালের ১৬

মার্চ আসামের পাথারকান্দির কলকলিঘাট রেলস্টেশনে আন্দোলনকারীদের একটি মিছিলে রাষ্ট্রের পুলিশ গুলি করে আন্দোলনকারীদের ওপর। মাতৃভাষার অধিকার চাইতে গিয়ে রাষ্ট্রের নৃশংস বন্দুকের গুলিতে জান দেন বিলবাড়ি গ্রামের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বিপ্লবী সুদেষ্ণা সিংহ। এই ঘটনায় অনেক ভাষাবিদ্রোহী আহত হন এবং ব্যাপক ধরপাকড় হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসকে আর উপেক্ষা করতে পারে না আসাম রাজ্য সরকার। আসাম রাজ্যের ইলিমেন্টারি এডুকেশন-এর ডেপুটি ডিরেক্টর ২০০১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বরাক উপত্যকার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অধ্যুষিত গ্রামের ৫২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার প্রথম পাঠ্যপুস্তক 'কনাক পাঠ' তৃতীয় শ্রেণিতে চালু করার সিদ্ধান্ত নেন। ২০০১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের সাহসী বীর কাকেত হেন্‌ইঞতা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ৫ নম্বর সেক্টরের লক্ষীপুর ক্যাম্পের হয়ে দায়িত্ব পালন করেন খাসিয়া বীরনারী কাকেত হেনইঞতা। প্রথমদিকে মুক্তিসেনাদের দেখাশোনা, খাবার ও অস্ত্র জোগান দেওয়ার পাশাপাশি যুদ্ধকালীন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর মুক্তিসেনাদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব নেবার পর প্রায় বিশটিরও বেশি সম্মুখযুদ্ধে তিনি অংশ নেন। তৎকালীন ৫ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মীর শওকত আলীর তত্ত্বাবধানে মহব্বতপুর, কান্দারগাঁও, বসরাই-টেংরাটিলা, বেনিংগাঁও-নূরপুর, পূর্ববাংলাবাজার, সিলাইড়পাড়, দোয়ারাবাজার, টেবলাই, তামাবিল এলাকায় সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন কাকেত। ১৯৭১ সালে আগস্ট মাসে পাক হানাদারবাহিনীর আগমন ঠেকানোর জন্য মুক্তিযোদ্ধারা জাউয়া সেতু উড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকবাহিনী তাঁকে আটক করে এবং ভয়াবহ নির্যাতন চালায়। তাঁর সারা শরীরে লোহার শিক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলার জিরারগাঁও এলাকায় তিনি 'খাসিয়া মুক্তি বেটি' হিসেবেই পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধের পর দীর্ঘ সময়ব্যাপী কেউ তাঁর খোঁজ নেয় নি, তখন প্রায় ভিক্ষা করে দিন কাটত তাঁর।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ৫ নম্বর সেক্টরের হয়ে প্রায় ২০টিরও বেশি সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেওয়া এই মহীয়সী মুক্তিযোদ্ধার কথা ১৯৯৭ সালে সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশবাসী জানতে পারেন। স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে কাকেত নামটি কঠিন মনে হওয়ায় সাংবাদিকরা তাঁর নাম দেন কাঁকন বিবি। কাকেত হেন্‌ইঞতা থেকে নূরজাহান, পরবর্তী সময়ে দেশব্যাপী তিনি কেবল কাঁকন বিবি নামেই পরিচিত হয়ে ওঠেন। স্থানীয় মানুষেরা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় তাঁকে ডাকে 'খাসিয়া মুক্তি বেটি'। ১৯৯৯ সালে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা তাঁকে ১৯৯৮ সালের গুণীজন সম্মাননা প্রদান করে। দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা পরবতীকালে তাঁকে প্রতিমাসে একটি নিয়মিত আর্থিক ভাতার ব্যবস্থা করলেও বেশ কিছুদিন যাবৎ তা বন্ধ আছে।

ভূমি অধিকার আন্দোলনের লড়াকু শহীদ গীদিতা রেমা

টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার এককালের শালবন এলাকার এক আদিবাসী গ্রাম মাগন্তিনগর। এই গ্রামেই ১৯৭১-এর পরপরই এক মান্দি কৃষক পরিবারে জন্ম নেন গীদিতা রেমা। গীদিতার মায়ের নাম দীপালি রেমা, বাবা গণেশ রিছিল (পাগলা)। মধুপুর থেকে পঁচিশমাইল নেমে বা টেলকি থেকে ভেতরে মাগন্তিনগর গীদিতাদের গ্রামে এখন বহিরাগত বাঙালির সংখ্যাই বেশি আর শালবনের কোনো বংশই নেই। এখন এই গ্রামে আনারস বাগানের এলাকাও কমে কলার বাগানে পরিণত হয়েছে। মাতৃসূত্রীয় মান্দি সমাজে নিজস্ব জুম-জমিন ভাগ বাটোয়ারার ক্ষেত্রে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে, পরিবারে মেয়েদের, বিশেষত ছোট মেয়েদের প্রধান্য দেওয়া হয়। সেই রীতিতে গীদিতাদের জমিনের অনেকটাই পায় গীদিতার ছোট বোন নম্রতা রেমা। আর এই জমির লোভেই এলাকার এককালের বহিরাগত বর্তমানের বাঙালি মফিজ গং নম্রতা রেমাকে অপহরণ করে জোর করে বিয়ে করে ও ধর্মান্তরিত করে। কিন্তু একমাস যেতে না যেতেই নম্রতা মফিজের কবল থেকে পালিয়ে মাগন্তিনগর তাদের বাড়িতে চলে আসে। মফিজের ভয়ে নম্রতাকে অন্য জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়। মফিজ বাঙালি ব্যাটাগিরি ফলাতে ২০০১-এর ২০ মার্চে সশস্ত্র হামলা করে গীদিতাদের বাড়ি। নম্রতাকে না পেয়ে গীদিতার ছোট বোন ইতালিন রেমাকে জোর করে অপহরণ করতে চাইলে গীদিতা বাধা দেয়। ধারালো অস্ত্র নিয়ে মফিজ গং গীদিতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খুন হন গীদিতা। মফিজ গং পালায়।

২০ মার্চ ২০০১ তারিখে খুন হওয়ার পর মধুপুর এলাকার বাইরের মানুষ হিসেবে সঞ্জীব দ্রং সাংবাদিকসহ ২৫ মার্চ গীদিতাদের গ্রামে যান। গীদিতার বোন কবিতা রেমা বাদী হয়ে মধুপুর থানায় খুনীদের নাম উল্লেখ করে মামলা করে। তারপর তো কত খবর আর কত প্রতিবাদ। কিন্তু কিছুই হয় নি। আসামিরা কেউ কেউ গ্রেপ্তার হলেও টাকা দিয়ে ছাড়া পেয়েছে। মধুপুর এলাকায় এখনো তারা বুক টাটিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বনবিভাগ বনাম শিশিলিয়া স্নালের বিধ্বস্ত শরীর

২১ আগস্ট ২০০৬ তারিখে বনবিভাগের গুলিতে রক্তাক্ত হয়েছিল টাঙ্গাইলের মধুপুর শালবন। ঠিক যেভাবে মধুপুর জঙ্গলে বনবিভাগ গুলি করে হত্যা করেছিল বিহেন নকরেককে, একইভাবে বনবিভাগ বিধ্বস্ত করেছে শিশিলিয়া স্নালের শরীর। ঘটনার দিন সাতারিয়া গ্রামের ফজলী দফো, ফলিদুত, শিশিলিয়া স্নালসহ ৮/১০ জন আদিবাসী মান্দি নারী মধুপুর জাতীয় উদ্যানের রসুলপুর সদর রেঞ্জের সাতারিয়া এলাকায় লাকড়ি কুড়াচ্ছিলেন। লাকড়ি কুড়ানোর সময় উত্তর রসুলপুরের একটি ফলবাগানের কাছের ঝোপে বসে বিশ্রাম নেওয়ার সময় রসুলপুর বিটের বিট কর্মকর্তা মো. মোশারফ হোসেন, বনপ্রহরী মো. নূরুল ইসলাম, আবদুল মালেক সরদার এবং আবদুল হাসেম ওরফে জ্বীনের বাদশা বিশ্রামরত আদিবাসী নারীদের দিকে তিন রাউন্ড গুলি ছোড়ে। ঘটনায় সাতারিয়া গ্রামের দরিদ্র আদিবাসী নারী শিশিলিয়া স্নালের পিঠ, কান, নাকসহ শরীরে প্রায় একশ'র মতো গুলি বিদ্ধ হয়। দৈনিক সমকাল (২২/৮/২০০৬) পত্রিকাকে সহকারী বন সংরক্ষক মো. জহুরুল হক জানিয়েছিলেন, কাঠ পাচার করার সময় গুলি চালালে এক কাঠ চোর আহত হয়। মানে বনবিভাগ গুলি করার কথা স্বীকার করেছে, কারণ বনবিভাগ জানে এতে

করে বনবিভাগের কিচ্ছু হবে না। কারণ বনবিভাগের সাথে দেশের বনবিরোধী পরিবেশবিনাশী আইন ও নীতিমালা আছে, শালবন ধ্বংসকারী দাতাসংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকেরা আছে, বনবিভাগের সাথে আদিবাসীখুনী রাষ্ট্র আছে।

বিচিত্র রাষ্ট্রের বিচিত্রা তির্কী

লিঙ্গীয় নিপীড়ন থাকলেও অধিকাংশ আদিবাসী সমাজে 'ধর্ষণ' নেই। ধর্ষণের মতো চূড়ান্ত লিঙ্গীয় বাহাদুরি বাঙালিরাই আদিবাসী সমাজে আমদানি করেছে। রাষ্ট্র এই অন্যায়ের বৈধতা দিচ্ছে। দেশজুড়ে কৃষক-মজুর থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধি পর্যন্ত আদিবাসী নারীরা নিপীড়িত। অধিকাংশ ধর্ষণ ঘটনার ক্ষেত্রে ধর্ষিতার নাম-পরিচয় গোপন রাখা হয়, কিন্তু বাংলাদেশে এমন নিদারুণ নীরবতা চুরমার করে ধর্ষণের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলেন জনপ্রতিনিধি বিচিত্রা তির্কী। ওঁরাও জাতির এই সংগ্রামী নারীর ওপর সাম্প্রতিক নৃশংস নিপীড়নকে বিষয় করে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ তাদের ২০১৪ সনের ১৪ আগস্টে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে :

> ...৪ আগস্ট ২০১৪ নিজ জমিতে আমন চারা রোপণের সময় বিচিত্রা তির্কির ওপর গোমস্তাপুর থানার জিনারপুর গ্রামের ভূমিদস্যু সন্ত্রাসী আফজাল হোসেন, মনিরুল ইসলাম, জেন্টু, বাদশা, মোজাম্মেল হক, আব্দুল হামিদ, হাজী আব্দুস সাত্তার, আবুল কালাম, মো. সালাম, রেজাউল করিম, শরিফ, আকবর আলী, শফিকুল আলম, এনায়েতপুর গ্রামের জিয়াউল করিম এবং পাশ্ববর্তী নিয়ামতপুর থানার, চোরাসমেসপুর গ্রামের মো. আ. রাজ্জাক, আক্তার হোসেন, আবুল কাশেম, নবিউদ্দিনসহ আরো ১৫-২০ জনের দুর্ধর্ষ লাঠিয়ালবাহিনী আক্রমণ চালায় এবং বিচিত্রা তির্কিকে পিটিয়ে জখম করে এবং তার উপর যৌন নির্যাতন চালায়। হামলার পর ভূমিদস্যুরা একজোড়া মহিষ, ১টি পাওয়ার টিলার ও ১টি শ্যালোমেশিন লুট করে নিয়ে যায়। তিনি এখন চাঁপাইনবাবগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। ঘটনার বহুদিন পেরিয়ে গেলেও মূল হোতাদের পুলিশ এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি। এখনো বিচিত্রার পরিবারকে ভূমিদস্যুরা প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। ফলে তার পরিবার এবং এলাকার আদিবাসীরা নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে।

এ ঘটনায় আফজাল হোসেন (৬০), মনিরুল ইসলাম ওরফে মন্টু (৪৭), জেন্টু (৪৫), বাদশা (৪৩), মোজাম্মেল হক, মো. আ. হামিদ (৬০), আ. সাত্তার হাজী (৬৫), আবুল কালাম (৩৫), মো. সালাম (৪০), রেজাউল করিম (৩০), শরিফ (২৫), আকবর আলী (২৫), রফিকুল ইসলাম (৪৫), মো. আ. রাজ্জাক (৪৫), মো. আখতার হোসেন (৩৭), মো. আবুল কাশেম (৪২), মো. নবীউদ্দীন (২৫), মো. জিয়াউল করিম (৩৫)-সহ অজ্ঞাতনামা আরো ১৫ জনের বিরুদ্ধে ২০১৪ সালের ৪ আগস্টে গোমস্তাপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে (মামলা নং ৪/১৭২VRXK, তারিখ ০৪-০৮-২০১৪)। এ

পর্যন্ত পুলিশ জিয়াউল করিম, আবুল কাশেম, আজিজুল আলম, আনিসুর রহমান, ডালিম এবং নুর মোহাম্মদ পলু— এই ৬ জনকে গ্রেপ্তার করলেও মূল আসামিদের বিচারের আওতায় আনতে প্রশাসন ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। আদিবাসী পরিষদ, ছাত্র পরিষদ উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় নানা ধরনের প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে। যার প্রতিটির নেতৃত্ব দিয়েছেন বিচিত্রা তির্কী। অদম্য সাহসী এই নারী আদিবাসী ভূমি দখলের বিরুদ্ধে জান বাজি রেখে লড়াই করে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। বাঙালি দখলদারদের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন ৪৮ বিঘা আদিবাসী ভূমি। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে ভূমিরক্ষার দাবিতে নওগাঁর পোরশা থেকে জেলা প্রশাসক কার্যালয় পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার পথ পুত্র সংগ্রামকে কোলে নিয়ে গণপদযাত্রায় অংশ নিয়ে স্থাপন করেছেন এক অনন্য নজির। তিনি ২০১১ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার পার্বতীপুর ইউনিয়নের সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে সমতলের আদিবাসী জনগণের অধিকার আদায়ে সংগ্রামরত জাতীয় আদিবাসী পরিষদের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি হন। জাগো নারী বহ্নিশিখা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা তাঁকে সম্মাননা দেয়। এ ছাড়াও, গ্রামীণ নারী অধিকার সুরক্ষায় পেয়েছেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন সম্মাননা।

বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ, সিলেট অঞ্চলের চাবাগান, টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ-গাজীপুর-শেরপুর-নেত্রকোনা অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূলীয় অঞ্চল সব মিলিয়ে দেশের সকল প্রান্তের আদিবাসী নারী-পুরুষেরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক দ্রোহী পাটাতন থেকেই। ১৮৫৫ সালের হুল বা সাঁওতাল বিদ্রোহ, উলগুলান বা মুণ্ডা বিদ্রোহ, তেভাগা, নানকার, টংক, হাতিখেদা বিদ্রোহ, খাসি বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ, নুপীলান বা মণিপুরী নারীদের বিদ্রোহ, ভানুবিল আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনের মতো নিম্নবর্গের সংগ্রামী উত্তরাধিকারই জন্ম দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের রক্তবলয়। কিন্তু ক্ষমতাকাঠামোর বলপ্রয়োগ আদিবাসীদের ঐতিহাসিক প্রতিরোধের ঝিলিককে বারবার মুখ চেপে ধরছে, গলা টিপে ধরেছে, রক্তাক্ত করেছে। সকল চোখরাঙানি আর আড়ালের ভেতরও অদৃশ্য করে রাখা আদিবাসী রক্তদানাই বহাল রেখেছে জনগণের মুক্তিসংগ্রাম, ইতিহাসের টগবগে রক্তস্রোত। যাকে কখনো কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের একপেশে অধিপতি বিজয়গাথায় বরাবরই ইতিহাসের সত্যিকারের রক্তদানার কোনো স্বীকৃতি ও সম্মান জোটে নি। তাই মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে নির্মিত দেশের সকল ভাস্কর্য, চলচিত্র, পুস্তক, নাটক, গান, কবিতা, নৃত্য কী চারুকলা সবকিছুই হয়েছে কেবল বাঙালি পুরুষেরই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

আমরা কি ভাবতে পারি 'অপরাজেয় বাংলা' কী 'সাবাস বাংলাদেশ' কী 'জাগ্রত চৌরঙ্গী' তৈরি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে একজন চাকমা বা সাঁওতাল বা কোচ বা মান্দি বা মুণ্ডা বা খাসি বা মৈতৈ বা মণিপুরী নারী-পুরুষের অবদানকে বিবেচনা করে? আমরা কি ধারণা করতে পারি প্রান্তিক জাতির একজন মুক্তিযোদ্ধা নারীর আদলে তৈরি হচ্ছে আমাদের কোনো মুক্তিযুদ্ধের 'জাতীয়' স্মারকস্তম্ভ? আমরা এখনো সেই বৈষম্যহীন মানবিক মনস্তত্ত্ব গড়ে তুলতে পারি নি। আদিবাসী নারীদের দ্রোহের এই ঐতিহাসিকতা অবধারিত কায়দায় এখনো বিদ্যমান ইতিহাস নির্মাণ কাঠামোতে আড়ালই থেকে গেছে।

মনস্তাত্ত্বিকভাবে পুরুষতান্ত্রিক এই রাষ্ট্রের নিম্নবর্গের মানুষেরা সব সময়ই নারীর ওপর যেকোনো ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সবসময়ই সংগঠিত হয়েছেন, সংগঠিত করেছেন অধিকার আদায়ের গণপ্রতিরোধ। কিন্তু ক্ষমতাকাঠামোর পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা নারী-পুরুষের সমঅধিকারের জীবনের লড়াই হুলসহ সকল আদিবাসী আন্দোলনকেই আজ কেবল পুরুষের আন্দোলন হিসেবে ব্যাখ্যা করতে তৎপর। আদিবাসী নারীরা যেমন নিরন্তর প্রতিরোধী হয়েছেন তার ঘর ও বাইরে, জমিন ও জঙ্গলে, পাহাড় ও সমতলে, গ্রাম-সমাজ-দেশ ও রাষ্ট্রে, আদিবাসী নারীদের সেই চিরঞ্জীব প্রতিরোধ থেকেই আমাদের জীবন জয়ের দীক্ষা নিতে হবে। আজকের এক একজন আদিবাসী নারীও সকল অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক একজন দ্রোহী বহ্নিশিখা। আর এই দ্রোহী বহ্নিশিখাদের আড়ালে রেখে বিরাজিত কোনো পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাস প্রক্রিয়ার বলপ্রয়োগ কখনোই জনগণ মেনে নেবে না, নারীর অধিকার কী নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়া কী নিম্নবর্গের শ্রেণিমুক্তি আন্দোলনে এই আদিবাসী বহ্নিশিখাদের দ্রোহকে দাবিয়ে রাখলে কখনোই গণমুক্তি সম্ভব নয়। বিষয়টি তাই নিম্নবর্গের রাজনৈতিক কায়দা থেকেই কেন্দ্রীয় মনোযোগে রাখা জরুরি। এখান থেকেই নিম্নবর্গের গণমুক্তির 'চিৎকার' পরিবর্তনকামী পাটাতনের পাঠ ও পাঠ্য হতে পারে।

পাভেল পার্থ প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষক। animistbangla@gmail.com